গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা | ৬ জুলাই ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com

শ্রমিককে মালিকের দাস বানাতেই ধর্মঘট বিরোধী অর্ডিন্যান্স

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

সারা ভারতের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত অস্ত্র কারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ২৬ জুলাইয়ের ধর্মঘট ভাঙতে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দানবীয় 'এসেন্সিয়াল ডিফেন্স সার্ভিস অর্ডিন্যান্স' (ইডিএসও) জারি করেছে, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত অস্ত্র কারখানাগুলিকে কর্পোরেট কোম্পানিতে পরিণত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে সেগুলিকে সাতটি কর্পোরেশনে ভাগ করে দিচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে সেগুলি বহুজাতিক ধনকুবেরদের হাতে তুলে দেওয়ার সুবিধা হবে। এর ফলে যেমন সারা দেশের ৪১টি রাষ্ট্রায়ত্ত অস্ত্র কারখানার ৭৬ হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, তেমনই ইতিমধ্যেই তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও সঙ্কুচিত হবে। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিক শ্রেণি ন্যায্য দাবিতে ধর্মঘট এবং প্রতিবাদের যে অধিকার আদায় করেছে, এই অর্ডিন্যান্স তাকে কবরস্থ করতেই আনা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের বাকশক্তিটুকুও কেড়ে নিয়ে তাদের পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে মুনাফালোভী বহুজাতিক ধনকুবেরদের সেবাদাসে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে

বিক্ষোভ রাজ্য জুড়ে

পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১-৭ জুলাই প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেয়। রাজ্যের সব জেলাতেই অসংখ্য বাজার, গঞ্জ এলাকায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। পোড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল। রাজ্য জুড়ে এই কর্মসূচিতে মানুষের মধ্যে প্রবল সাড়া পড়ে। ৬ জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস অশোক সামন্ত, তরুণ মণ্ডল, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস রবি বসু ও অজয় চ্যাটার্জী। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, বক্তব্য রাখেন কমরেড তরুণ মণ্ডল। কলকাতার ঢাকুরিয়ায় প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করে। কলকাতার নানা এলাকা সহ ওই দিন রাজ্যের সব জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

বর্তমান সময়ে একদিকে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির বোঝা, অন্যদিকে করোনা অতিমারির কবলে সারা দেশের মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। কত পরিবার যে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, কত পরিবার করোনা চিকিৎসা করাতে গিয়ে পথের ভিখারি হয়ে গেছে, তার সঠিক হিসাব নেই। টিকার চরম আকাল দেশ জুড়ে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিতে চড়া দামে টিকা বিকোচ্ছে কর্পোরেট হাসপাতালে, গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ টিকার জন্য হা-পিত্যেশ করে থেকেও তা পাচ্ছেন না।

এর মধ্যে মাত্র দু'মাসেই ২ কোটির বেশি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। যাদের কাজ টিকেও আছে তাদের অনেকেরই কমেছে মজুরি। রোজগারের সমস্ত সুযোগ হারিয়ে কোটি কোটি মানুষ আজ

চারের পাতায় দেখুন

কলকাতার এসপ্ল্যানেডে বিক্ষোভ শেষে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

বাসভাড়া নির্ধারণে নিরপেক্ষ কমিটি চাই

পরিবহণমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

পরিবহণমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ জুলাই এক স্মারকপত্রে বলেন, করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ কমতে থাকার বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর সরকারি ও বেসরকারি বাস চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে বাস মালিকরা বাস চালুর আগেই দাবি তুলেছেন বিপুল হারে ভাড়া বৃদ্ধির।

করোনা অতিমারিতে সাধারণ মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ, অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই ও কলকারখানা বন্ধ থাকার কারণে জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত পেট্রল-ডিজেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়েই চলেছে। প্রতি লিটার পেট্রলে ৩২ টাকা ৯০পয়সা এবং প্রতি লিটার ডিজেলে ৩১ টাকা ৮০ পয়সা ট্যাক্স শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই আদায় করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই রকম ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে রান্নার গ্যাস এবং কেরোসিনের দামও।

করোনা বিপর্যস্ত জনগণের কাছ থেকে যাকে কার্যত লুট বললেও কম বলা হয়। জনজীবনের এই দুঃসময়েকেন্দ্রীয় সরকারের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের আচরণ 'ক্ষমার অযোগ্য'

বলতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টকেও

পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের নিষ্ঠুর আচরণ দেখে করোনা অতিমারির প্রথম দফার লকডাউনের সময়েই সারা দেশের মানুষ শিউরে উঠেছে। সরকারের আচরণের জন্য এই কোটি কোটি মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে সংবেদনশীল মানুষ কেঁদেছেন, নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারের কর্তাদের তাতে কিছুই যে এসে যায়নি তা তাদের আচরণেই স্পষ্ট। অতিমারির দ্বিতীয় অভিঘাতের সময়তেও একই ভাবে তারা নির্বিকার। সারা দেশে মানুষ দাবি জানিয়েছে অবিলম্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে সরকার দাঁড়াক, তাদের বেতন, খাদ্য, পরিবারের নিরাপত্তা সরকার নিশ্চিত করুক। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা অবশেষে দ্বারস্থ হয়েছিলেন শীর্ষ আদালতের এবং আদালতের পক্ষেও এই ন্যায্য দাবিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ২৯ জুন, আদালত পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি কিচেন এবং রেশনের বন্দোবস্ত করে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের এই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য

পরিযায়ী শ্রমিকদের রেশন কার্ড

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে বিধান পরিষদ গঠন সম্পূর্ণ যুক্তিহীন

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সম্পাদকের চিঠি

জনগণের করের টাকা খরচ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধান পরিষদ গঠনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক বলে মনে করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। সরকারকে এই বিধান পরিষদ গঠন করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠান। নিচে সেটি প্রকাশ করা হল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন করে বিধান পরিষদ গঠন করতে চলেছে। এই পরিষদ গঠন করার জন্য দশ বছর আগে গত ২৮ জুন ২০১১ তৃণমূলের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম সরকার বিধানসভায় আইন প্রণয়ন করে। এর তীব্র প্রতিবাদ করে এসইউসিআই(সি)-র তরফ থেকে তখনই আপনাকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। বিধানসভার অন্দরেও আমাদের প্রতিনিধি এই বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। জনমতও এই পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে ছিল। সেকথা বিবেচনা করে আইন পাশ হলেও রাজ্য সরকার তখন ঐ পরিষদ গঠন করা থেকে বিরত হয়েছিল। কিন্তু, কী কারণে আবার আপনার সরকার বিধান পরিষদ গঠন করতে চলেছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এদেশে বা আমাদের রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠনের প্রশ্নটি নতুন নয়। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণ করে এদেশে লোকসভার উপরে রাজ্যসভা চাপিয়েদেওয়া হয়েছিল। ইংল্যান্ডে যেমন সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত 'হাউস অফ কমন্স'-এর উপর অভিজাত ও সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত 'হাউস অফ লর্ডস' চাপানো আছে। ইতিহাস বলছে, রেনেসাঁ আন্দোলন ও শিল্প বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা 'হাউস অফ কমন্স' গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হলে তা অভিজাতদের স্বার্থে ও সম্মানে লাগে। তাই তাদের খুশি করার জন্য ব্রিটিশ আইনে 'হাউস অফ লর্ডসের' ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত কোনও আইনসভাকে সমর্থন করতেন না।

লোকসভায় গৃহীত কোনও বিলকে আইনে পরিণত করতে গেলে যেমন রাজ্যসভার অনুমোদন লাগে, বিধানসভায় গৃহীত বিলকে তেমনই বিধান পরিষদে পাশ করাতে হয় এবং তাতে অনাবশ্যক বিলম্ব হয়। স্বাধীনতার পর বহু রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করা হলেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অসুবিধার জন্য তা অবলুপ্ত করা হয় এবং মাত্র ২-৩টি রাজ্যে এখন তার অস্তিত্ব আছে। কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন বিজেপি এই রাজ্যগুলির কয়েকটি জায়গায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বিধান পরিষদ বাতিলের দাবি গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই উঠেছিল এবং ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিধানসভা এবং তৎকালীন বিধান পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদন নিয়ে বিধান পরিষদ অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ফলে, আবার বিধান পরিষদ গঠনের কোনও যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না।

আপনি জানেন, রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে এই অতিমারির কারণে ও আম্ফান-ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ বেকার, কর্মচ্যুত শ্রমিক, দিনমজুর, পরিচারিকা, হকার, ফিরে আসা কর্মহীন পরিযায়ী শ্রমিকের রুজি-রোজগারের কোনও সুযোগ নেই। গ্রামে কৃষকদের করুণ অবস্থার কথা আপনার অজানা নয়। অসংখ্য মানুষ স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন-রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের নাগালের বাইরে। করোনা রোগীর চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক হাসপাতালের বেড ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার টাকাও সরকার জোগাড় করতে পারছে না। এই অবস্থায় বিধান পরিষদ গঠন, তার সদস্যদের বেতন ও ভাতা বাবদ বছরে যে কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে, তা কেন রাজ্য সরকার বহন করবে? সেই টাকা তো গরিব করদাতাদের পকেট থেকেই যাবে!

এর জন্য শুধু বিপুল আর্থিক দায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপবে তাই নয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জটিলতা বাড়বে। দেশের বেশিরভাগ রাজ্য ইতিমধ্যে বিধান পরিষদ তুলে দিয়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যদি এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে, তাহলে তার একটিই অর্থ দাঁড়াবে— শাসক দলের যে নেতাদের বিধানসভা অথবা লোকসভায় জায়গা করে দেওয়া যায়নি, জনগণের পকেট কেটে বিধান পরিষদে তাদের জায়গা করে দিয়ে সন্তুষ্ট করা।

আমাদের প্রত্যাশা আপনি সব দিক বিবেচনা করে বিধান পরিষদ গঠনের কাজ থেকে বিরত হবেন।

'ক্ষমার অযোগ্য'

একের পাতার পর

সম্পন্ন করতে হবে, যাতে একজন পরিযায়ী শ্রমিককেও এই অতিমারির সময়ে ক্ষুধার্ত না থাকতে হয়। একটা সভ্য দেশের সরকারের এমনিতেই যে কাজটা করার কথা ছিল, সেটুকু করাবার জন্যও শীর্ষ আদালতকে নির্দেশ দিতে হচ্ছে! অথচ এই করোনা মহামারীর মধ্যেও একচেটিয়া মালিক ধনকুবরদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা পাইয়ে দিতে তো কোনও নির্দেশের অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হয়নি! এর পরও কি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায় না যে, সরকারটা আসলে কাদের?

এই নির্দেশেও কতটা কাজ হবে সে প্রশ্ন থাকছেই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা অন্তত গরিব মানুষের জন্য একটু হলেও মাথা ঘামাতে বাধ্য হবেন এ আশা অনেকে করছেন। যদিও, দেখা যাচ্ছে সরকারের ইচ্ছা মেনেই আদালতও বলেছে একমাস আগে অনলাইন অ্যাপ মাধ্যমে অভুক্ত মানুষটিকে জানিয়ে দিতে হবে তিনি কোথা থেকে রেশন তুলবেন! তার মানে, রেশন পেতে গেলে হাতে একটি স্মার্ট ফোন অতি-আবশ্যক! সরকার বেতন নিশ্চিত করল না, আশ্রয়ের ব্যস্থা করল না, পরিবার প্রতিপালনের উপায় কী হবে বলল না, চিকিৎসার দায়িত্ব নিল না। কিন্তু রেশনে একমুঠো চাল-গম পেতে আগে স্মার্ট ফোন কেনা জরুরি করে দিল! এই পরিযায়ী শ্রমিকরা কোথায় থাকেন, সে তথ্য জোগাড় কি সরকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল, যে এর দায় শ্রমিকদের ঘাড়েই চাপাতে হল? অথচ ভোটের সময় এই শ্রমিকদেরই ভোট নিতে একেবারে তাদের বাড়িতে পর্যন্ত সরকারি অফিসার থেকে নেতা-মন্ত্রীদের পর্যন্ত লাইন লেগে যায়! সত্য সেলুকাস...!

ভারতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ৩৮ কোটি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশি। অথচ অশিক্ষা ও দারিদ্রের কারণে তাঁরা সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের কোনও পরিচয়পত্রও নেই। বিশেষত করোনা পরিস্থিতিতে কাজ চলে যাওয়ায় এরা দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদাটুকুও মেটাতে পারছে না। অথচ দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশে এদের অবদান অনস্বীকার্য। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেও এই চিত্র ধরা পড়েছে। আদালত সরকারকে মনে করিয়ে দিয়েছে খাদ্যের অধিকার জীবনধারনের মৌলিক প্রয়োজনগুলির অন্যতম এবং মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজ হারানো মানুষগুলির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরেই ১০০ দিনের কাজের অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। অথচ এই সরকারই কর্পোরেটদের জন্য ২৭ হাজার কোটি টাকা ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করেছিল। দেশে-বিদেশে বিপুল সমালোচনার মুখে সরকার সেদিন বলেছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের এত বিপুল সংখ্যা নাকি সরকারের জানা ছিল না। সেদিন তারা ঘোষণা করেছিল দেশের পরিযায়ী ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সঠিক তথ্য নথিভুক্ত করা হবে। এ জন্য 'ন্যাশনাল ডাটাবেস ফর আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কারস'(এনডিইউডব্লুই) নামে একটি পোর্টাল তারা প্রস্তুত করবেন। তার জন্য বরাদ্দও করা হয়েছিল ৪৫.৩৯ কোটি টাকা। কিন্তু এক বছরের মধ্যেও কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর সেই কাজ শেষ করেনি। ফলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন সরকার আবারও লকডাউন ঘোষণা করল, তখনও এই মানুষগুলিকে সুরক্ষা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা সরকার করতে পারল না। সরকারের এই নির্লিপ্ত মনোভাবকে শীর্ষ আদালত 'ক্ষমার অযোগ্য' বলে অভিযুক্ত করেছে। সত্যিই আজ দেশের মানুষের মনের কথাও এটাই— এ সরকারের অচরণ ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু কর্পোরেট সেবায় মগ্ন, ক্ষমতা ধরে রাখার নিকৃষ্ট রাজনীতির কূটকৌশলে মরিয়া বিজেপি নেতাদের কাছে আর্ত মানুষের এই কান্নার কোনও দাম নেই। আজ আদালতের যতটুকু ইতিবাচক রায় মানুষ পাচ্ছে তার পিছনে আছে বহু মানুষের আত্মদান। শত রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের মধ্যেও এনআরসি বিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন যেভাবে মাথা তুলেছে, রাজ্যে রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যতটুকু পরিসর তৈরি হচ্ছে তার জমির উপর দাঁড়িয়েই সাধারণ মানুষের কথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আদালতে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি আদায় করতে পারছে। এই পরিসরটুকু ধরে রাখতে গেলেও চাই লাগাতার গণআন্দোলনের জোয়ার— সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

ধর্মঘট বিরোধী অর্ডিন্যান্স

একের পাতার পর

এই অর্ডিন্যান্স যেভাবে ধর্মঘটে যোগদানকারী শ্রমিক এবং তাদের 'ইন্ধনদাতা'দের কমপক্ষে ২ বছর জেল ও জরিমানার শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছে, আমরা তারও তীব্র নিন্দা করছি। আমরা ২৬ জুলাইয়ের প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা দাবি করছি, সরকারকে অবিলম্বে অস্ত্র কারখানাগুলিকে কর্পোরেট কোম্পানি করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে এবং দানবীয় 'ইডিএসও' প্রত্যাহার করতে হবে। এ দেশের শ্রমিক শ্রেণির কাছে আমাদের আবেদন, সরকারের সমস্ত জনবিরোধী ও শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তা প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করুন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্তও ১ জুলাই এক বিবৃতিতে এই অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। কমিউন গুণগত ভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমেই প্রশাসন থেকে আমলাতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে কমিউন। ভাড়াটে সেনাবাহিনীর পরিবর্তে জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। কমিউন সদস্য, কর্মচারী, অফিসারদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়, যা একজন দক্ষ শ্রমিকের বেতনের মোটামুটি সমান। আট ঘণ্টা শ্রমসময় নির্দিষ্ট করে দেয়। শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা, রুটির কারখানায় রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রমকমিশন গঠিত হয়। যে সব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেকার শ্রমিকদের কাজ ও সাহায্যের ঘোষণা করা হয়। অফিসার, সেনা অফিসার, বিচারপতি সকলের নির্বাচিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সব ধরনের নির্বাচিত ব্যক্তি অযোগ্য প্রমাণিত হলে নির্বাচকদের হাতে তাদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শিক্ষা হয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। কমিউন শাসনে এই প্রথম শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

কিন্তু নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ৭২ দিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কমিউনকে ধ্বংস করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মানবমুক্তির দিশারী কার্ল মার্কস তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন, সমৃদ্ধ করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য-প্রয়োজন। প্যারি কমিউনের এই মহান সংগ্রামের ইতিহাস জানা সমস্ত মার্কসবাদীর অবশ্য-কর্তব্য। ২০১১ সালে গণদাবীতে এই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও কিছু সংযোজন ও সম্পাদনা করে ধারাবাহিক ভাবে সেটিকে আমরা প্রকাশ করছি।

আগের তিনটি কিস্তিতে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন, পুনরায় বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা দখল, ১৮৩০-এ জুলাই বিদ্রোহে অর্লিয়ানিস্ট বংশের লুই ফিলিপের ক্ষমতা দখল এবং ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবিধান পরিষদ থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিতাড়ন এবং ২২ জুন শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহকে নৃশংস ভাবে দমনের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা আলোচিত হয়েছে। এ বার চতুর্থ কিস্তি। — সম্পাদক, গণদাবী

৪

অর্লিয় শাসক লুই ফিলিপের আমল থেকেই প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা 'ন্যাশনাল' (ত্ত্বব্ধন্স্ত্রপ্ত) নামে প্যারিসের এক পত্রিকার চারপাশে জড়ো হয়ে তাদের মতবাদিক এবং সাংগঠনিক কাজকর্ম চালাতে থাকে। তাদের গোষ্ঠীটি ন্যাশনাল গোষ্ঠী নামেই পরিচিত হয়। ৪ মে-র নির্বাচনে গঠিত জাতীয় সভা যে কার্যনির্বাহক কমিশন গঠন করে তার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি এই গোষ্ঠীই দখল নিয়েছিল। নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি পদে বসেই সরকারি সব দপ্তর থেকে ন্যাশনাল অনুগামী সবাইকে সরালেন। মন্ত্রিসভায় ভিড় দেখা গেল লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী রাজতন্ত্রীদের। জাতীয় সভার সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের শেষ আশ্রয় ছিল এই জাতীয় সভা। এই সংঘর্ষের পরিণাম হিসাবে নেপোলিয়ন ও রাজতন্ত্রীরা মিলিত ভাবে জাতীয় সভাকে অকেজো করে তুলল।

শিল্পীর তুলিতে প্যারি কমিউনের সংগ্রাম

এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে এল জাতীয় বিধানসভার নির্বাচন। পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুটি প্রধান দল— শৃঙ্খলা পার্টি আর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বা লাল পার্টি। রাজতন্ত্রী অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টরা শৃঙখলা পার্টিতে জোট বাঁধল। প্রথম নেপোলিয়নের পতনের পর শাসনক্ষমতায় বুরবোঁ রাজবংশকে সামনে রেখে যে বৃহৎ ভূস্বামীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তারাই লেজিটিমিস্ট। অপর অংশটি অর্থজগতের অভিজাতবর্গ এবং প্রধান শিল্পপতির দল জুলাই প্রজাতন্ত্রের আমলে অর্লিয় রাজবংশের লুই ফিলিপকে সামনে রেখে শাসন চালিয়েছিল, এরা অর্লিয়ান্সী। এই উভয় শক্তিই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল। লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এই দুই শক্তিই পুনরায় ক্ষমতার অলিন্দে ফিরে আসে এবং জুন বিপ্লবের পরই তারা শৃঙ্খলা পার্টির নামে (ত্ত্বজব্ধন্ত স্নন্দ্র ব্ধড়দ্ব থজস্তুন্দ্বজ) পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়। অন্য দিকে শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়া পার্টির মিলনে গঠিত হয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি তথা লাল পার্টি। এর মধ্যে ছিল পেটি বুর্জোয়াদের মুখপাত্র মতাঁইনিয়াঁর (ত্তস্নঃব্ধস্নন্ধজস্তু অর্থাৎ ত্তস্নত্তঃব্ধন্ঃ) তথা পর্বত দল। সম্মিলিত বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণির যে অংশ ইতিমধ্যেই বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তারও নিজেদের যুক্ত করল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। এই দুই শক্তি হল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৩ মে-র সাধারণ নির্বাচনে ৭৫০টি আসনের ৫০০টিতে রাজতন্ত্রীরা নির্বাচিত হলেন। বামপন্থীরা পেল ২০০ আসন। প্যারিসের সব আসন তাদের দখলে থাকল। তাদের নেতা লেদ্রু রলাঁ পাঁচটি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হলেন। এতদিন যে গ্রামাঞ্চল রক্ষণশীলদের ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল সেখানেও লাল পার্টির প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেল।

উল্লেখ করা দরকার, বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা একটা স্বতন্ত্র সংসদীয় দল গঠনের পক্ষে সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। তাই তারা শৃঙ্খলা পার্টির লেজুড় হয়েই থাকল। শৃঙ্খলা পার্টির হাতেই রইল সরকারি ক্ষমতা, সেনাবাহিনী এবং আইন তৈরির ক্ষমতা। অর্থাৎ গোটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটাই। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির চরিত্র বিশ্লেষণ করে মার্ক্স দেখালেন, প্রলেতারিয়েতের সামাজিক দাবিগুলির বিপ্লবী মুখটা ভেঙে গণতান্ত্রিক দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হল, আবার পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপটি খসিয়ে এগিয়ে দেওয়া হল তার সমাজতন্ত্রী মুখটা। এই ভাবেই গড়ে উঠল সোস্যাল ডেমোক্রেসি। স্বাভাবিক ভাবেই এই সোস্যাল ডেমোক্রেসি এমন কিছু গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দাবি তুলল, সেগুলি পুঁজি ও মজুরির মতো দুই চরম বিপরীত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে না, বরং এদের মধ্যেকার শত্রুভাব কমিয়ে সামঞ্জস্য আনবে। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল তার বিপ্লবী চরিত্রের অভাবের জন্য এবং দোদুল্যমান চরিত্রের জন্যই নেপোলিয়নের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রীদের প্রবল আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়ল।

এই অবস্থায় প্রজাতন্ত্রী, পেটি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতকে শায়েস্তা করতে জরুরি অবস্থা জারি করল সরকার। নতুন আইন এনে জনপ্রতিনিধিদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। নতুন মুদ্রণ আইন এনে বিরোধী পত্রিকাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। এবার আঘাত আর শুধু প্যারিসের উপর নয়। জেলাগুলির ওপরও সামরিক নির্যাতন নামিয়ে আনা হল। পেটি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত কার্যকলাপের ঘাঁটি 'ক্লাব'গুলো বন্ধ করে দেওয়া হল।

ফলে গুপ্তসমিতিগুলির কার্যকলাপ দ্রুত বাড়তে থাকল। শ্রমিকদের শিল্প সমবায়গুলি রাজনৈতিক ভাবে প্রলেতারিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকে রাজতন্ত্রীরা শ্রমিকদের আবার ক্ষমতা দখলের, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার গুজব ছড়াতে থাকল।

নেপোলিয়নের মধ্যে প্রথম থেকেই বাসা বেঁধেছিল যে ভাবে হোক পুরনো সাম্রাজ্যটা ফিরিয়ে আনার আকাঙ্খা। শুরু হল জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুই নেপোলিয়নের সঙ্গে সাংবিধানিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের বিরোধ। বুর্জোয়া ব্যক্তিশাসক বনাম বুর্জোয়া শ্রেণির বিশেষ এক অংশের স্বার্থের বিরোধ। রাজতন্ত্রী লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ানিস্টদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছিল। এই উভয় গোষ্ঠীই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছিল।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ১৮৪৯-এর ১ নভেম্বর লুই বোনাপার্ট ওদিলন বারো মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন। গঠন করলেন নতুন মন্ত্রিসভা, যা তাঁর নিজের মন্ত্রিসভা। এর মধ্যে দিয়ে নেপোলিয়ন বুর্জোয়া শ্রেণিকে বুঝিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতিরূপী নেপোলিয়নই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। এই অবস্থাতেও বুর্জোয়ারা খানিকটা নির্বিকারই থাকল। কারণ তাদের জানা ছিল, ১৮৫২ তেই নেপোলিয়নের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। সংবিধান কোনও ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার অধিকার দেয়নি।

ইতিমধ্যে ১৮৫০-এর ১০ মার্চের উপনির্বাচনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তিরিশটি আসনের মধ্যে কুড়িটিতেই নির্বাচিত হল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। প্যারির তিনটি আসনেই জয়ী হল বামপন্থীরা— জুন অভ্যুত্থানের নায়ক দ্য ফ্লত, অস্থায়ী সরকারের আমলে শ্রমিক কল্যাণের জন্য গঠিত লুকসেমবুর্গ কমিশনে লুই ব্লাঁ-র সচিব ভিদাল ও অস্থায়ী সরকারের প্রজাতন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী কার্নো।

নির্বাচনী ফলাফলে হতভম্ব হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। তাদের মধ্যে লাল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ১০ মার্চের নির্বাচনের ফলাফল যেন ১৯৪৮ এর জুনকে বাতিল করে দিল। নেপোলিয়নের এক মন্ত্রীও পরাজিত হলেন, সেই অর্থে যা নেপোলিয়নের পরাজয়। শৃঙ্খলা পার্টি হুঙ্কার ছাড়ল,

চারের পাতায় দেখুন

প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর

তিনের পাতার পর

‘১০ মার্চের ভোটের অর্থ যুদ্ধ’। হাঁক দিল, ‘আরও পীড়ন চাই, দশগুণ পীড়ন’। বলল, ‘নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অসম্ভব’। রাজতন্ত্রীরা, শৃঙ্খলারা বলল, যত নষ্টের গোড়া ওই সর্বজনীন ভোটাধিকার। আওয়াজ তুলল, সর্বজনীন ভোটাধিকার ধ্বংস কর। ১৮৫০ এর ৩১ মে নতুন নির্বাচনী আইনে বিলোপ করা হল সর্বজনীন ভোটাধিকার। ৯৫ লক্ষের ভোটার তালিকা থেকে ৩০ লক্ষ শ্রমজীবী ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হল। মার্কস ৩১ মে-র আইনকে বলেছেন, বুর্জোয়া শ্রেণির কু-দেতা। আসলে ১০ মার্চের ফলাফলটা বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। তাই শ্রেণি সংগ্রামের জন্য এই আইনটা বুর্জোয়াদের কাছে ছিল একটি জরুরি প্রয়োজন।

সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করা মাত্র জাতীয় সভা এবং বোনাপার্টের সংগ্রাম আবার শুরু হল। বুর্জোয়া ব্যক্তিশাসক বনাম বুর্জোয়া শ্রেণির বিশেষ এক অংশের স্বার্থের বিরোধে বাণিজ্য বুর্জোয়ারা ও ছোট পুঁজির মালিকরা লুই নেপোলিয়ানকে সমর্থন করেছিল। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধেজনক বলেই তারা নেপোলিয়নকে সমর্থন করেছিল। এছাড়া প্রধানত যে সম্প্রদায়ের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন তা হল ছোট ছোট জমির মালিক গোষ্ঠী। সে সময়ে ফ্রান্সে বিরাট সংখ্যায় কৃষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় থেকেই বুর্জোয়াদের অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শহরের কিছু বড় বড় শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট জমির মালিকরা একসময় নিজেদের স্বার্থেই বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে বুর্জোয়া মালিকানা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ বুর্জোয়া সৃষ্টি হলেও, এই গ্রামীণ বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও শহরের সুদখোর মহাজনেরা শোষণ শুরু করলে ছোট জমির মালিকরা বুর্জোয়া বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এদের একাংশ, নিজেদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হওয়ায় নিজেদের শ্রেণিস্বার্থকে ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে টিকিয়ে রাখাতে তৎপর না হয়ে শ্রমিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া বিরোধী প্রগতিশীল সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং ফ্রান্সে যে সব কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয় তাতে তারা নেতৃত্ব দেয়। অপর এক অংশ সমাজ বিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হওয়ায় রক্ষণশীল ভূমিকা নেয় এবং ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে নিজেদের সুযোগসুবিধা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বিরোধী অবস্থান নেয়। এই অংশের রাজনৈতিক চেতনার মান নিম্নস্তরে থাকার ফলে পরিষদে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থকে প্রতিফলিত করতে পারেনি। নিজেদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়াও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একমাত্র কোনও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক শক্তিই পারে এদের নেতৃত্ব দিতে। সে কারণে এরা লুই নেপোলিয়নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই জাতীয় পরিষদের সভাপতি ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়ার লড়াইয়ে এরা নেপোলিয়নের পক্ষ সমর্থন করে। এই সময়ে শ্রেণিসংগ্রাম হয়ে পড়ে জটিল। একদিকে ছিল প্রগতিশীল শ্রমিকশ্রেণি, অন্য দিকে বুর্জোয়াদের পরস্পরবিরোধী নানা গোষ্ঠী। নিজ নিজ গোষ্ঠী স্বার্থেই এরা বুর্জোয়াদের অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়।

বোনাপার্ট তাঁর নিজের ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে বছরে ৩০ লক্ষ ফ্রাঁ দাবি করলেন। সংবিধান সভা তা নাকচ করে দিল। এই সুযোগে নেপোলিয়ন নিজেকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে জাহির করার সুযোগ খুঁজে নিলেন। ১০ অক্টোবর বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। মন্ত্রীরা তাদের পদত্যাগপত্র দাখিল করল। ১৮৫১-র জানুয়ারিতে নেপোলিয়ন সেনাবাহিনীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে তার প্রধান, মন্ত্রীসভার আস্থাভাজন শাঙ্গার্নিয়ারকে বরখাস্ত করে আলজিরিয়া থেকে প্যারিসে ফিরিয়ে আনলেন কলোনিয়াল জেনারেলদের— যাদের গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না।

সংবিধান সভা নেপোলিয়নকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার জন্য সংবিধান সংশোধনে কোনও ভাবেই রাজি না হওয়ায় নেপোলিয়ন সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভাগের বড়কর্তাদের নিয়ে ক্ষমতা দখলের ছক করতে লাগল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন নিজেকে শৃঙ্খলার রক্ষক এবং শান্তির দূত হিসাবে নিজেকে তুলে ধরলেন। বুর্জোয়াদের একটা অংশের সমর্থনও এ ব্যাপারে নেপোলিয়ন পেয়ে গেলেন। অর্থনীতিতে চাঙ্গা ভাব কেটে গিয়ে বাণিজ্যে যখন মন্দা এল, ১৮৫১-র শেষ দিকে, তখন বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টীয় সংগ্রামকেই মন্দার কারণ বলে অভিযোগ করল, তারা এই লড়াই বন্ধ করার দাবি তুলল। লড়াই বন্ধের দুটি রাস্তা ছিল— বোনাপার্টের ক্ষমতা চলতে দেওয়া অথবা সংবিধানসম্মত উপায়ে তার অবসরগ্রহণ। বুর্জোয়াদের একটি অংশ নেপোলিয়নের অবসর চাইলেও অপর একটি গোষ্ঠী চেয়েছিল বোনাপার্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতির আসনে ইতিমধ্যেই আসীন, তাই তিনি সেখানেই থাকুন। বুর্জোয়াদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে নেপোলিয়ন পুরোপুরি কাজে লাগালেন।

১৮৫১-র ২ ডিসেম্বর। অতর্কিত হানা দিয়ে নেপোলিয়নের অনুগত সেনাবাহিনী আইনসভা, সংবাদপত্র অফিস, ছাপাখানা আর প্যারিস শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে নিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই প্যারির মানুষ দেখল, আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, নতুন সংবিধান তৈরির কাজ চলছে, যা একটি গণভোটে অনুমোদিত হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকার নাকি আবার ফিরে এসেছে! জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদনপত্রে রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডাস্থল বলে নিন্দা করেছেন। আর একটি ঘোষণায় সৈন্যদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, সৈনিকরা, আপনারা দেশকে বাঁচান।

শুরু হল ধরপাকড়। আইনসভার ষোল জন সদস্য সহ আশিজন বিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করা হল। আইনসভার তিনশজন সদস্যকে সভাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হল না। গোটা ফ্রান্সে বিরোধী গোষ্ঠীর ২৬০০ নেতা ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হল কোনও আইনের পরোয়া না করেই। সারা প্যারিসের পোস্টারে ছয়লাপ করে দেওয়া হল— দেশকে বাঁচাও! নেপোলিয়নকে সমর্থন করো! নেপালিনয়ই সঙ্কট-কবলিত দেশের একমাত্র ত্রাতা।

২০ ডিসেম্বর গণভোট নেওয়া হল তাঁর কার্যকাল বাড়ানোর জন্য। ৭৫ লক্ষ ভোট পড়ল নেপোলিয়নের পক্ষে। নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন, আমি বিপ্লবের যুগের অবসান ঘটিয়েছি। প্যারিসের শ্রমিকরা অবশ্য এই কু দেতা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। সৈন্যদের গুলিতে যাঁরা প্রাণ হারালেন তাঁদের অধিকাংশ শ্রমিক। ২৬০০ শ্রমিক ও তার নেতাদের গ্রেফতার ও নির্বাসন দেওয়া হল। দেলেসক্লুজ, লেদ্রু রোলাঁ, লুই ব্লাঁ সহ বহু সমাজতন্ত্রী নেতাদের নির্বাসিত করা হল।

১৮৫২ নভেম্বরে আরও এক গণভোটের আড়ালে বংশানুক্রমিক সম্রাটতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনলেন লুই বোনাপার্ট। আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। লুই বোনাপার্ট নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসাবে ঘোষণা করলেন। এবার ভোট পেলেন ৭৮ লক্ষ। মার্ক্স বললেন, দ্বিতীয় সাম্রাজ্য শৃঙ্খলা পার্টি মার্কা প্রজাতন্ত্রেরই জারজ সন্তান!

ক্রমশ

রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

চরম অসহায়।

এই পরিস্থিতিতে মানুষ ভেবেছিল, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটু সুরাহার বন্দোবস্ত করবে। কিন্তু কোথায় সুরাহা? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে পেট্রল-ডিজেলের দাম প্রতিদিন বাড়তে বাড়তে প্রায় ১০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে। রান্নার গ্যাসের দামও প্রায় হাজার টাকা ছুঁতে চলেছে। এমনকি গরিব মানুষের প্রয়োজনীয় জ্বালানি কেরোসিনের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়ায় তার দামও আকাশছোঁয়া। তেলের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথেই সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে ব্যাপক হারে। সমস্ত ভোজ্য তেলের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। বেড়েছে চাল, ডাল সহ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের দাম। দাম কমানোর কোনও চেষ্টা দূরে থাক, অতিমারির সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে দুর্বল করে দিয়ে ফরচুন, রিলায়েন্স, আইটিসির মতো কর্পোরেট কোম্পানির ধনকুবের মালিকদের লাগামছাড়া লাভের রাস্তা খুলে দিয়েছে। পেট্রোপণ্যের ব্যবসায় সরকার এবং দেশি-বিদেশি তেল কোম্পানিগুলো এক বিপুল লুঠের কারবার খুলেছে। এ বছরই ১২ জুন পর্যন্ত ৪৮ বার তেলের দাম বেড়েছে। ২০১৪-২০২০— বিজেপি শাসনের এই ছ’বছরে পেট্রল-ডিজেলে সরকারের কর বেড়েছে ৩০০ শতাংশ (হিন্দুস্তান টাইমস, ২২ মার্চ, ’২১)। তথ্য বলছে, কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে এখন দেশে তেলের উপর ট্যাক্স আদায় করছে ৬৩ শতাংশ (দ্য হিন্দু ডট কম, ৩১ মে, ‘২১)। সরকারের পাশাপাশি মানুষকে লুটছে রিলায়েন্স, এসার, আদানি গোষ্ঠী সহ সরকারি তেল কোম্পানিগুলি। তাদের মুনাফা প্রতি তিন মাসে দ্বিগুণ, তিনগুণ হারে বাড়ছে। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এখন ২০১৪ সালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এছাড়াও সরকারের মদতে তেল কোম্পানিগুলি বিপুল পরিমাণ তেল তিন-চার মাস আগেই স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভের নামে মজুত করে নিয়েছে। সে সময় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল একেবারে তলানিতে। এখন আন্তর্জাতিক বাজারে সামান্য দাম বাড়লেই, এমনকি না বাড়লেও তারা ভারতে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী বলছেন এই বাড়তি লাভ নাকি তাঁরা করোনা চিকিৎসায় খরচ করছেন।

সাধারণ মানুষ লক্ষ করছেন কেন্দ্রীয় সরকার কাজ হারানো, খেটে-খাওয়া মানুষের হাতে ত্রাণ প্যাকেজ না দিয়ে ২০ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে একচেটিয়া মালিকদের। শিল্পপতিদের এই তালিকায় এখন বড় বড় ব্যবসায়ীদেরও যুক্ত করেছে। মানুষ ত্রাণ প্যাকেজের দাবি জানালেও সরকার তা শুনছে না। সরকারি উদাসীনতা এত মারাত্মক যে, সুপ্রিম কোর্টকেও বলতে হয়েছে, গরিব মানুষের জন্য রেশনে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও দায়বদ্ধতাই অনুভব করছে না। এস ইউ সি আই (সি) দাবি, রেশনে পর্যাপ্ত চাল, গম, সরষের তেল বিনামূল্যে দিতে হবে।

করোনায় বিপর্যস্ত মানুষ প্রতিবাদ করতে পারবেন না, এই হিসাব কষে তারা জনবিরোধী কৃষি আইন, শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড, জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন, শিক্ষার উপর আঘাত হানা শিক্ষানীতি এই সময়েই চাপিয়ে দিয়েছে। একচেটিয়া মালিকদের হাতে বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে রাষ্ট্রায়ত্ত নানা সংস্থা। প্রতিবাদ সপ্তাহে এই নীতিগুলির জনবিরোধী চরিত্র তুলে ধরেছে দলের নেতা-কর্মীরা।

এস ইউ সি আই (সি) বরাবরই বলছে, কোনও সরকার এসে সোনার বাংলা নাকি সোনার ভারত গড়বে, সেই খোয়াব দেখে ভোটের রাজনীতির চক্করে ফেঁসে গেলে এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মানুষের মুক্তি নেই। একমাত্র পথ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়। সমস্ত পেশার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সংঘবদ্ধ গণকমিটি গড়ে তুলে এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সরকারের এই লুঠের কারবার বন্ধ করা সম্ভব।

বিধানসভার গেটে বিক্ষোভ এ আই ডি এস ও-র

কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্ত ধরনের ফি মকুব ও ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সব ছাত্র ছাত্রীকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে ক্লাসরুম শিক্ষা চালুর দাবিতে ২ জুলাই বিধানসভার গেটে বিক্ষোভ দেখাল এ আই ডি এস ও। বিক্ষোভকারীদের সকলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, আমরা করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্রদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার জন্য একাধিকবার শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু তাঁরা সময় দেননি। ফলে বিধানসভা শুরুর দিনে গেটে তাঁদের সাথে দেখা করতেই ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছেন।

শহরতলির ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন

মথুরাপুর স্টেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

শহরতলির ট্রেন চলাচল বৃদ্ধির দাবিতে ২৭ জুন থেকে ২ জুলাই এ আই এম এস এস, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই ডি এস ও বিক্ষোভ দেখায়। লকডাউনে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার জন্য সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যাতায়াত করতে ব্যাপক অসুবিধায় পড়ছেন। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, যাঁরা নানা ধরনের কাজ করে কোনওক্রমে দিন গুজরান করেন যারা, তারা কর্মস্থলে পৌঁছতে পারছেন না। তিন সংগঠনের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্টেশনে বিক্ষোভ হয়। বারুইপুর, সোনারপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, দক্ষিণ বারাসাত, মথুরাপুর, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, মাঝেরহাট, শ্যামনগর, কৃষ্ণনগর, হাবড়া, মছলন্দপুর, বারাসাত, সাঁতরাগাছি, বেলুড়, শিয়ালদা সহ বহু স্টেশনে বিক্ষোভ মিছিল ও স্টেশন ম্যানেজারের কাছে দাবিসনদ সহ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সব স্টেশনের রেল আধিকারিকরাই গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য শোনেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের দাবিসনদ পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

ফি বৃদ্ধি বিরোধী ছাত্র কমিটির জয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে এনরোলমেন্ট ফি সহ সব ধরনের ফি মকুবের দাবিতে 'ফি প্রতিরোধী ছাত্র কমিটি' আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৮ জুন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটির ডাকে ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান। বহু টালবাহানার পর ছাত্র আন্দোলনের চাপে পড়ে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন এবং ফি মকুবের নোটিশ প্রকাশ করেন। কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফি মকুবের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করল ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনই ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আন্দোলন রুখতে কর্তৃপক্ষের দমন নীতি এবং তাদের নির্দেশে পুলিশি হস্তক্ষেপ ও আন্দোলনকারীদের শারীরিক নিগ্রহের ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানান তাঁরা।

কলকাতা জেলা শিক্ষা কনভেনশন

১ জুলাই এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটির আহ্বানে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মানস ঘোষ, শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, এআইডিএসও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। অধ্যাপক মানস ঘোষ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার সরকারি নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। স্কুলশিক্ষার বেহাল দশার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা চৌধুরী। তিনি ভ্রান্ত জাতীয় শিক্ষানীতির ভয়ঙ্কর দিকগুলি সম্পর্কে ছাত্রসমাজকে সচেতন করেন।

কনভেনশনে দাবি উঠেছে— মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফর্ম ফিলাপের টাকা ফেরৎ দিতে হবে, চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের ফি মকুব করতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ভার সরকারকে নিতে হবে, সমস্ত কোর্সে আসনসংখ্যা বাড়িয়ে সকল ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে, করোনা ও ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকে নিতে হবে, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে টিকা দিয়ে অবিলম্বে ক্লাসরুম পঠন পাঠন শুরু করতে হবে।

রাজ্য সম্পাদক দাবিগুলি নিয়ে বলেন, অনলাইন নয়, আমরা চাই ক্লাসরুমে শিক্ষা। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মধ্য দিয়ে আসলে শিক্ষার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব অস্বীকার করে শিক্ষাকে মহার্ঘ পণ্যে পরিণত করার পথে চলেছে সরকার। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড সুমন দাস।

ভাড়া না বাড়ানোর দাবি পরিবহণ যাত্রী কমিটির

করোনাক্লিষ্ট জনসাধারণের ঘাড়ে বাসের বাড়তি ভাড়ার বোঝা না চাপিয়ে, পেট্রল-ডিজেলে ট্যাক্স কমানোর দাবিতে ৪ জুলাই পরিবহণ যাত্রী কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর শাখার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও পরিবহণমন্ত্রীকে ই-মেল করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপির প্রতিলিপি জেলাশাসককেও দেওয়া হয়। কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, জনগণের আয় তলানিতে। এই অবস্থায় সরকার প্রয়োজনে বাস মালিকদের ভর্তুকি দিক। কিন্তু কোনও মতেই ভাড়া বাড়ানো চলবে না।

ঋণ নয়, চাই সরকারি খরচে শিক্ষা

দাবি এআইডিএসও-র

সম্প্রতি রাজ্য সরকার দশম শ্রেণি থেকে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত চালু করেছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। এই কার্ডের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণ নিতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নপূরণ করবে এবং তাদের পড়াশুনা করার জন্যে অসুবিধায় পড়তে হবে না। এ প্রসঙ্গে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা থেকেই পরিষ্কার, এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বপ্ন অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যার মূল কারণ অত্যধিক ফি। স্কুল স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অত্যধিক হারে ফি-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বিপুল খরচ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে দিচ্ছে। অভিভাবকরা চরম অর্থনৈতিক সংকটে। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে জমি-বাড়ি, সহায় সম্বলটুকু বন্ধক রেখে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বহু চমকদার প্রকল্প ঘোষণা করলেও শিক্ষার মূল পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রের বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করার দিকে এগোচ্ছে না।

সরকার একদিকে শিক্ষার ব্যয় ক্রমাগত বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চালু করে ছাত্রসমাজের ত্রাতা সাজতে চাইছে। বাস্তবে এই ঋণ প্রকল্প একদল কর্মসংস্থানহীন এবং ক্রমবর্ধমান সুদের ভারে জর্জরিত ঋণগ্রস্ত অসহায় নাগরিক সৃষ্টি করবে। সরকার বলেছে, এই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করার পর চাকরি পেয়ে পনেরো বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ সহ তা শোধ করা যাবে। কিন্তু চাকরি না পেলে? ঋণগ্রহীতাদের জন্য শিক্ষান্তে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে কি সরকার ? দেশে বেকারত্বের হার বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় এই প্রকল্পকে প্রতারণা ছাড়া কি বলা যায়!

পাশাপাশি এই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা নিয়ে একদল ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং লবির দ্বারস্থ হবে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় ফুলে ফেঁপে উঠবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কোচিং লবিগুলি। সরকারি এই প্রকল্প শিক্ষা ব্যবসায় এবং কর্পোরেটদের স্বার্থে চলা বর্তমান ক্রেডিট-নির্ভর অর্থনীতিতে সাময়িক একটা তেজি ভাব আনবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের শিক্ষার অধিকারকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দেবে। সরকার কৌশলে শিক্ষার অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সমস্ত ব্যয়ভার ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এই ব্যয়ভার বহন করার জন্য শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা সহজ করে দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি ঘটবে এবং সমস্ত ধরনের স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ বন্ধ করে ঋণনির্ভর শিক্ষা প্রবর্তন অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে।

এআইডিএসও-র দাবি, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের পরিবর্তে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে ফি-র বোঝা লাঘব করুক। শিক্ষা হোক অবৈতনিক।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর চলছে নজিরবিহীন জুলুমবাজি

পশ্চিমবাংলার ১ কোটি ৬০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্রাহক রয়েছেন প্রবল সমস্যায়। করোনা ও তার জেরে লকডাউনে অর্থনীতি বিপর্যস্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ নেই। আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের বেতন কমে গেছে। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের অত্যধিক দামবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে প্রবল সঙ্কটের গহ্বরে ফেলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইয়াস ঝড়ে বেশ কিছু জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ঘর-বাড়ি, মাঠের ফসল, সঞ্চিত খাদ্যশস্য, গবাদি পশু, পুকুরের মাছ, সবজি-ফল সব শেষ। সমুদ্রের নোনাজল ঢুকে চাষের জমি নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যুতের খুঁটি-তার-মিটার কিছুই নেই। বিদ্যুৎ বিল সহ দরকারি সমস্ত কাগজ-পত্র বন্যার জলে ভেসে গেছে। এই অবস্থায় বিদ্যুৎ দপ্তর গ্রাহকদের পাশে না দাঁড়িয়ে তাদের উপর মারণ আঘাত হানছে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিদ্যুৎ বিল দিতে একটু দেরি হলেই ডিপিএসসি-র (ডিলে পেমেন্ট সারচার্জ) নামে বা এলপিএসসি-র (লেট পেমেন্ট সারচার্জ) নামে ২৪ শতাংশ ফাইন আদায় করছে। ঘটছে লাইন কাটার ঘটনাও। ওরা লাইন কাটবে, সেজন্য গ্রাহককে টাকা দিতে হবে, আবার লাইন জোড়া দেওয়ার জন্য টাকা দিতে হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরের এমন খামখেয়ালিপনায় গ্রাহকরা জর্জরিত।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি যতটুকু দেওয়া হয় সেটা বন্ধ করার রাস্তাটা বের করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য। ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়া কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের ঘোষিত নীতি। এই নীতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ আর পরিষেবার বিষয় নয়, মুনাফা করার পণ্য। বিদ্যুৎকে পণ্য হিসাবে ঘোষণা করেই জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ এনেছিল প্রথম বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। তার ধাক্কাতেই বিদ্যুৎ মাশুল লাগামহীন। মাশুল বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কিন্তু তাতেও কোম্পানি খুশি নয়। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলিকে আরও বেশি মুনাফা পাইয়ে দিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এনেছে বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২১। যার মূল কথা হল বিদ্যুৎকে যৌথ তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা, রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একচেটিয়া কেন্দ্রীয়করণ করা, অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিবহণ ও বন্টন— সমস্তই বেসরকারি কর্পোরেটের সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার হাঙ্গরের হাতে তুলে দেওয়া।

রাজ্যের হাতে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কী কী বিষয় রয়েছে? নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিল, খারাপ মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিসেবা নিয়ে অভিযোগ, সর্বোপরি বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ, সরকারি ভর্তুকি— এ সবের নিষ্পত্তির কিছুটা অধিকার এখনও রাজ্যের হাতে আছে। এই বিলের মধ্যে দিয়ে তার সমস্তটা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হাইকোর্টের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী 'ইলেকট্রিসিটি কনট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট অথরিটি' নামের নতুন সংস্থাকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্রস সাবসিডি তুলে দিয়ে সকলের বিদ্যুতের দাম সমান করে দেওয়ার নামে বাস্তবে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের দাম কমিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের দাম ব্যাপক বাড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বন্টন এই তিনটি বিভাগ করার পর আবারও নতুন করে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এবং প্রতি ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৬ শতাংশ মুনাফা করার যে আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে তার ফলে মাশুল বেড়ে চলেছে এবং আরও বাড়বে পর্বতপ্রমাণ, গ্রাহক হয়রানি হবে চূড়ান্ত। কর্পোরেট হাউসের মুনাফার স্বার্থে দেশের গ্রাহকদের অন্ধকারে রেখে বিদেশে বিদ্যুৎ বিক্রি করার জন্য নতুন করে আনা হয়েছে 'ক্রস বর্ডার' ধারা।

করোনা সংক্রমণের ভয়ে মিটার রিডিং নেওয়া বন্ধ, কিন্তু গড় বিল করার রেগুলেশনের সুযোগ নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গড় বিল পাঠানো চলছেই। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো এই সুযোগে বাড়তি টাকার বিল দেদার পাঠিয়ে চলেছে। অভিযোগ করলে বলছে, আগে বিল মেটান, পরে অভিযোগ শোনা হবে। এভাবে চলছে গ্রাহকদের উপর জুলুমবাজি। বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২১ এখনও আইনে পরিণত হয়নি, কিন্তু তার প্রয়োগ রাজ্যে রাজ্যে শুরু হয়েছে নতুন কৌশলে, প্রতারণার ছদ্মবেশে, স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্ট (এসবিডি) -র নামে। যার মূল লক্ষ্য ১) রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চুক্তিবদ্ধ দামে ব্যক্তি শিল্পপতিদের কাছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সবটুকু সম্পদ বিক্রি করা। ২) বন্টন কোম্পানির জমি-বাড়ি নামমাত্র ভাড়ায় ব্যক্তি মালিককে ব্যবহার করতে দেওয়া। ৩) বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্মচারীতে পরিণত করা। এক কথায় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কোটি কোটি টাকার সম্পদ যা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে উঠেছে, তা বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিতেই বিদ্যুৎ বিল-২০২১ আনা হয়েছে। এতে শুধু গ্রাহকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা নয়, বিপন্ন হবেন কর্মচারীরাও।

সরকারের সহায়তায় ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরে টাটা, এসার, আদানি, গোয়েঙ্কা, টোরেন্ট ইত্যাদি কোম্পানিগুলো ঢুকে পড়েছে। এখন বিডিং-এর নামে পুরো বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাকে মাত্র কয়েকজন একচেটিয়া কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে চাইছে। পুদুচেরি, জম্মু ও চণ্ডীগড় প্রভৃতি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বন্টন ব্যবস্থাকে কর্পোরেটের কাছে বিক্রি করার নোটিশ জারি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারও পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমকে বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে সারা দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মচারী সংগঠন আন্দোলন করেছে। কাজ বয়কটের ডাক দিয়ে আন্দোলনে নতুন মাত্রা দিয়েছে। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) সেই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার তাদের জনবিরোধী সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনের এ এক বিরাট জয়।

শুধু বিজেপি নয়, পূর্বতন সিপিএম সরকার এ রাজ্যে সিইএসসি-কে গোয়েঙ্কার হাতে তুলে দিয়েছে। বেসরকারিকরণের যে পথ তারা দেখিয়েছে সে পথেই তৃণমূল সরকারও তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেসরকারিকরণে কয়েক ধাপ এগিয়েছে। ইতিমধ্যেই মিটার রিডার, বিল তৈরি, বিল বন্টন, মেরামতি, নতুন কানেকশন দেওয়া সহ যাবতীয় কাজ কন্ট্রাক্টরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালনের বহু বিষয় এখন কন্ট্রাক্টরদের অধীন। এ রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে ইতিমধ্যেই নতুন জনবিরোধী রেগুলেশন হয়েছে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই। সেই রেগুলেশনে বলা হয়েছে, কেউ ইচ্ছা করলেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারবেন না। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ও ব্যবহার করতে হলে লাইসেন্স নিতে হবে। সেই লাইসেন্সের শর্ত হচ্ছে, যিনি যতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন তাকে তার সবটুকুই পূর্ব নির্ধারিত দামে ন্যাশনাল গ্রিডে বিক্রি করতে হবে। তারপর সেই বিদ্যুৎ তার ঘরে বাধ্যতামূলকভাবে লাগানো 'নেট মিটারিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির নির্ধারিত দাম দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়া চালু করা হয়েছে প্রিপেড মোবাইলের মতো প্রিপেড মিটার, যেখানে টাকা শেষ হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি মিটার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এ কথা সকলেই জানেন, জীবিত মানুষের অক্সিজেন যেমন প্রয়োজন, মানব সমাজকে সচল রাখতে বিদ্যুতের প্রয়োজনও তেমনই। দেশের তথা মানবসমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান উপাদানই বিদ্যুৎ। যে দেশের বিদ্যুতের ব্যবহার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। ১৯১৭ সালে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিক পর পরই মহান লেনিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীন সমস্ত নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুতের নীতি বাস্তবায়িত

নয়ের পাতায় দেখুন

পরিবহণমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

একের পাতার পর

এত বড় একটা অন্যায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নীরব। আপনি ভালো করেই জানেন এর কারণ— রাজ্য সরকারও এই অস্বাভাবিক বর্ধিত মূল্যের উপর আবারও বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়ে কোষাগার ভর্তি করছে। যার ফলে বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম দাঁড়িয়েছে মূল দামের প্রায় তিনগুণের কাছাকাছি।

বাস মালিকরা এবং তাদের সংগঠন পেট্রল-ডিজেলের অন্যায় এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করছে না। তেলের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে আরও বিপুল হারে বর্ধিত ভাড়ার অসহনীয়বোঝা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেই তাদের উৎসাহ।

কলকাতায় আরটিএ অফিসে বিক্ষোভ। ৫ জুলাই

আপনি অবগত যে, ইতিমধ্যেই এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে লোকাল ট্রেন চালুর দাবি জানানো হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত লোকাল ট্রেন চালালেই দূরত্ব বিধি মেনে সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করা বাস্তবে সম্ভব হত বলে আমরা মনে করি। কিন্তুসে দাবি মানা হয়নি। পেটের তাগিদে কাজের সন্ধান করতে কিংবা চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য স্বল্প বেতনের কর্মীকেও বাধ্য হতে হয়েছে অটো-টোটো সহ অন্যান্য পরিবহণে বহু টাকা খরচ করে যাতায়াত করতে। এই বাড়তি খরচ আর হয়রানিকে দেখিয়ে, মানুষের মনে সুকৌশলে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তারা বর্ধিত বাসের ভাড়া মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক ও মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বাস মালিকদের ইচ্ছামত ভাড়া বাড়িয়ে নেওয়ার এই কৌশল ও চাপের কাছে মাথা নত না করে, আমরা চাই রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াক।

কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও তার উপর ট্যাক্স চাপানোর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার তার ভূমিকা পালন করুন।

একই সাথে আমাদের দাবি জনস্বার্থে পেট্রল-ডিজেলের উপর থেকে রাজ্য সরকারের চাপানো ট্যাক্স প্রত্যাহার করুন। যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধি এবং রোড ট্যাক্সের ছুতোয় ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতেরও আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রয়োজন হলে সরকারের পক্ষ থেকে রোড ট্যাক্স কমানোহোক। যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করুক। কোনও অজুহাতেই জনগণের ঘাড়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা নামিয়ে আনা চলবে না।

আমাদের দাবি, সুষ্ঠু ভাড়া নির্ধারণের জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিটি তৈরি করা হোক। যাত্রী পরিবহণ কমিটির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক সেই কমিটিতে। সেই কমিটি সমস্ত দিক বিবেচনা করে দ্রুত ভাড়া নির্ধারণ করুক। প্রয়োজন হলে সরকার ভর্তুকি দিয়ে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষকে পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির দুঃসহ চাপ থেকে রেহাই দিক।

তৃণমূলের খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ৪ জুলাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

জেলাজুড়ে মৈপীঠ সংহতি দিবস পালিত

৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে পালিত হল মৈপীঠ সংহতি দিবস। গত বছর ৪ জুলাই কুলতলীর মৈপীঠ অঞ্চলে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড সুধাংশু জানাকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে খুন করে। শতাধিক বাড়ি, দোকান পুড়িয়ে দেয়, ভাঙচুর করে, ব্যাপক মারধর করে ২৫-৩০ জনকে সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে।

জয়নগর জেলা দপ্তরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

কেন এই সন্ত্রাস? কারণ কমরেড সুধাংশু জানার নেতৃত্বে এলাকার মানুষ তৃণমূলের আমফান দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। ফলে দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিত হামলা চালিয়ে আন্দোলনের নেতাকে খুন করে। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরছে। ধারাবাহিক সন্ত্রাস চলছে। পুলিশ প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও খুনিদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। প্রতিদিন মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হচ্ছে দলের কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষকে। তৃণমূলের ধারাবাহিক সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে সারা জেলা জুড়ে পালিত হল মৈপীঠ সংহতি দিবস।

প্রবল সন্ত্রাস, জীবননাশের হুমকি ও ভারী বৃষ্টির মধ্যে মৈপীঠের পাঁচমাথার মোড়ে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন পালিত, জেলা কমিটির সদস্য প্রকাশ মাইতি সহ স্থানীয় কমরেড ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। ওই দিন মেরিগঞ্জ ১ ও প্রিয়র মোড়ে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বারুইপুর, জয়নগর, ক্যানিং, নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর, গোসাবা, বাসন্তী, জি-প্লট, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ডহারবার, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, রায়দিঘী, কুলপী, উস্তি, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর সহ ৭৫টি জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল, বিক্ষোভ সভা, প্রচার ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান প্রভৃতি সংঘটিত হয়। সর্বত্র আওয়াজ উঠেছে অবিলম্বে খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। জয়নগর জেলা অফিসে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের পক্ষে কমরেড মঙ্গলময় মুখার্জি, রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাদার আলি নস্কর এবং রাজ্য ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জি, নন্দ কুণ্ডু, গীতা জানা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মেরিগঞ্জ ১-এ সভা

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার বালি অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি)-র সূচনালগ্নের একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড সাহিদুর রেজা বিশ্বাস (বাপি) ৩১মে করোনা পরবর্তী ফুসফুসের সংক্রমণে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

কমরেড সাহিদুর ১৯৮৩-৮৪ সাল নাগাদ তাঁর বড়দা বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড হাসানুর রেজা বিশ্বাসের সূত্র ধরে দলে যোগ দেন। অসম্ভব সাহস, নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এই সমস্ত গুণাবলির জন্যই এলাকা জুড়ে সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এলাকায় কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সঙ্গীত জগতের মানুষের মধ্যে তিনি দলকে নিয়ে গেছেন। দলের নির্দেশে নির্বাচনের কাজে চাপড়ায় যান, তাঁর মধুর ব্যবহারেই সেখানকার মানুষের একজন হয়ে যান। পরবর্তীকালে দলের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও দলের খোঁজখবর রাখতেন এবং নতুন কর্মী সমর্থক যুক্ত হলে খুশি হতেন। প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ২২ জুন বালি পিস অ্যাকাডেমিতে। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট জননেতা কমরেড সেখ খোদাবক্স। সভাপতিত্ব করেন দলের বালি লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির সম্পাদক কমরেড জান্নাত আলী।

কমরেড সাহিদুর রেজা বিশ্বাস লাল সেলাম

মানবাধিকার কর্মী স্ট্যান স্বামীর জেলবন্দি অবস্থায় মৃত্যু পরিকল্পিত হত্যা

প্রতিবাদ মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর

৮৪ বছরের জেসুইট পাদ্রী স্ট্যান স্বামীর মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হল ৫ জুলাই। অশীতিপর এই বৃদ্ধের জামিন রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে এনআইএ একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিল। ফলে বারবার তাঁর জামিনের আবেদন আদালতে নাকচ হয়ে যায়। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অগ্রণী এই ব্যক্তিত্বকে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে ইউএপিএ আইনে জেলে ভরেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ভীমা-কোরেগাঁও তথা এলগার পরিষদের মামলাতেও তাঁকে আসামি করা হয়। পার্কিনসন ছাড়াও বয়ঃজনিত স্মৃতিভ্রংশে আক্রান্ত স্ট্যানের সাধারণ মানবিক প্রাপ্যটুকুও অস্বীকার করে এনআইএ আদালতে জানায়, স্ট্যানের চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন নেই। চশমা ছাড়া স্ট্যান দেখতে পেতেন না। কাপ এবং স্ট্র দিয়ে তরল খাবার ছাড়া তিনি খেতে পারতেন না। অথচ তাঁকে চশমা কিংবা স্ট্র কিছুই দেওয়া হয়নি। চিকিৎসার জন্য জেল হাসপাতাল ছাড়া অন্য হাসপাতালে যেতেও বাধা দিয়েছে এনআইএ। বাস্তবিক চিকিৎসার বিষয়ে রাষ্ট্র তাঁর সম্পর্কে যে নির্মম উদাসীনতা দেখাল তা ভয়াবহ। বাস্তবে এ মৃত্যু নয়, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে পরিকল্পিত হত্যা।

স্ট্যান স্বামী দানবীয় আইন ইউএপিএ-র বিধানকে মুম্বই হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জামিনের আবেদন করে দাবি করেছিলেন, এই আইন সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের সামনে এক দুর্ভেদ্য বাধা তৈরি করেছে। তিনি আবেদনে বলেন, ইউএপিএর ধারা ৪৩ ডি (৫) অভিযুক্ত ব্যক্তির সংবিধান প্রদত্ত জীবন ও স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। তিনি নির্দিষ্ট ভাবে দেখান, ন্যায় বিচারের মৌলিক তত্ত্ব হল, যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ বিচারকের চোখে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ। কিন্তু ইউএপিএ-র মতো আইনে অভিযুক্তকে দোষী ধরে নিয়েই বিচার শুরু হয়। ফলে সরকারি পক্ষ যা বলে সেটাই আদালতে শিরোধার্য হয়ে ওঠে। নানা কঠোর শর্ত আরোপ করে কার্যত জামিনের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকেই খর্ব করে এই আইন।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংগঠন সিপিডিআরএস স্ট্যান স্বামীর প্রতি এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, বিচারের নামে প্রহসন এবং চিকিৎসাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে হত্যার তীব্র নিন্দা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত সবার শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিশর্ত মুক্তি ও ইউএপিএ আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ জুলাই রাজ্যপালকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

রায়গঞ্জে বিক্ষোভ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিলাপের টাকা ফেরত দিতে হবে, শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে ও স্কুল কলেজ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ধরনের ফি মকুব করার দাবিতে ২-৮ জুলাই এআইডিএসও সারা রাজ্যে দাবি সপ্তাহ পালন করে। এই দাবি সপ্তাহকে সামনে রেখে ৪ জুলাই উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলের সামনে সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত, সৌমিত্র রজক প্রমুখ।

ত্রাণকাজে এআইডিএসও

ঝাড়গ্রাম ঃ অতিমারি পরিস্থিতিতে ২৮ জুন এআইডিএসওর পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুরে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক কমরেড সুরজিৎ সামন্ত।

দার্জিলিং ঃ ২৯ জুন দার্জিলিং জেলার বালাসন এলাকায় করোনা ও লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে।

বরুণ বিশ্বাস প্রয়াণ দিবসে এআইডিএসও-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এআইডিএসও-র বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ে। বরুণ বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক, রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিশ্বজিৎ রায় ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

ডিওয়াইও প্রতিষ্ঠা দিবসে আলোচনা সভা

২৬ জুন বিপ্লবী যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৭ জুন নদীয়া জেলার বারুইপাড়া গ্রামে শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতিভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইও-র নদীয়া জেলা নেতৃত্ব ও মুখ্য আলোচক ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) -র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান।

কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে
কৃষক বিক্ষোভ নকশালবাড়িতে

‘জান দেব, প্রাণ দেব, জমি দেব না’— আবারও এই প্রত্যয় ঘোষিত হল দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে। এবার জমি অধিগ্রহণে নেমেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। পুলিশ ফাঁড়ি করার নামে সরকার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম অঞ্চলের চারটি গ্রামের ১০৫ একর জমি অধিগ্রহণে নেমেছে। এই জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন যাঁরা তাঁরা আজ উচ্ছেদের মুখে। কোথায় যাবেন তাঁরা? কাজ নেই, লকডাউনে মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো এসেছে এই উচ্ছেদের ফরমান। ফলে আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই। চারটি গ্রামের কৃষকরা ‘মেছি কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি’ গঠন করে আন্দোলনে নেমেছেন। ৫ জুলাই দুই শতাধিক কৃষক ৬ কিমি রাস্তা মিছিল করে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি হরদেব মল্লিক, সহ সভাপতি কৃষ্ণ বাহাদুর থাপা, জয় লোধ প্রমুখ।

নন্দীগ্রাম ও সোনামুখীতে ত্রাণ বিতরণ

নন্দীগ্রাম ঃ ইয়াস বিধ্বস্ত নন্দীগ্রাম ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে ত্রাণসামগ্রী দিল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং অঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি। ৪ জুলাই কালিচরণপুর অঞ্চলের নাকচিরাচর গ্রামের ৮০ জন অধিবাসীদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

সোনামুখী ঃ ২৭ জুন বাঁকুড়ার সোনামুখীতে অ্যাবেকা এবং এমএসসি-র উদ্যোগে ৫০টি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

রাস্তা সংস্কার সহ নানা দাবিতে বিক্ষোভ

২ জুন কলকাতার সরশুনা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে আশুতি ২ পঞ্চায়েত অঞ্চলে জমা জল নিষ্কাশন, চরিয়াল এবং কলাগাছিয়া খাল সংস্কার ও বেহাল রাস্তা সংস্কার, পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের ব্যবস্থা এবং বর্ষার জলে সৃষ্ট রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার দাবিতে চৌরাস্তা বিডিও অফিসের (টি এম ব্লক) আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া যাদের রেশন কার্ড হয়নি তাদের রেশন কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আদিবাসীদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে
আন্দোলনের ডাক হুল দিবসে

১৮৫৫ সালে ছোটনাগপুরের ভগ্না ডিহির মাঠ থেকে তৎকালীন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনজাতি উপজাতি ও শোষিত নিপীড়িত মানুষকে সাথে নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর সেনানী সিধু, কানহু, চাঁদ ভৈরবের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গরিব মানুষ সামিল হয়েছিলেন তৎকালীন শাসক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও জমিদার মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে। হাজার হাজার মানুষ এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। শহিদ হয়েছিলেন সিধু কানহু। ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে ৩০ জুন হুল দিবস পালিত হল রাজ্যের নানা স্থানে। বহু সংগঠন এই দিনটি মর্যাদার সাথে পালন করে।

কলকাতার সিধু কানহু ডহর

সিধু কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩০ জুন হুল দিবস, পালিত হল কলকাতার সিধু কানহু ডহরে। সিধু কানহু-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সমিতির সম্পাদক পরিমল হাঁসদা বলেন, ‘মূর্তি নগরী’ এই কলকাতা, অথচ কলকাতার সিধু কানহু ডহরে সিধু কানহু-র মূর্তি নেই। সমিতি ১৯৮৩ সাল থেকে সরকারি উদ্যোগে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছে। অবিলম্বে কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে সরকারি অর্থে সিদো কানহু-র মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা

বক্তারা বলেন, আদিবাসীদের জমি-জল-জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোনও অবস্থাতেই আদিবাসী ও গরিব মানুষকে তাদের অধিকৃত বা দখলকৃত জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। দাবি করা হয়, ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬ সম্পূর্ণ রূপে লাগু করে সকল আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের অধিকৃত জঙ্গলের জমির পাট্টা দিতে হবে এবং কোনও অবস্থাতেই ‘সান্তাল পরগণাস টেনেন্সি অ্যাক্ট’ ও ‘ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট’ সহ অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসীদের জমি রক্ষার আইন সংশোধনের নামে পাল্টে দেওয়া চলবে না।

হুল দিবস স্মরণে এ আই ডি এস ও-র মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন অনুষ্ঠান সংগঠিত হয় শ্যামলাপুর সিধু কানহু মূর্তির পাদদেশে।

মেখলিগঞ্জে বিক্ষোভ

ফের ২৫ টাকা বেড়ে রান্নার গ্যাসের দাম হল ৮৬১ টাকা। রান্নার গ্যাস, পেট্রল ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটি ১ জুলাই মেখলিগঞ্জ শহরে মিছিল সংঘটিত করে

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

গোসাবায় ইয়াস দুর্গতদের মাঝে মেডিকেল ক্যাম্পে ডাঃ কাফিল খান

রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারেরযৌথ উদ্যোগে ইয়াস পরবর্তী পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত দশটি ক্যাম্প করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজার পরিবারকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে ও ১০০০-এর বেশি রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে। ৪ জুলাই গোসাবা ব্লকের উত্তর রাঙাবেলিয়া, পাখিরালা ও রানীপুর এই তিন জায়গায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ও ওষুধ দেওয়া হয়। মোট ৮০০ টি পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করা হয় এবং ৩০০ রোগী দেখা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই ক্যাম্পগুলোতে উপস্থিত ছিলেন মানবতাবাদী, শিশু চিকিৎসক, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অগ্রগণ্য সৈনিক ডাঃ কাফিল খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র এবং পিএএমপিএআই-এর ক্যানিং মহকুমা কমিটির সভাপতি জগদীশ জানা ও গোসাবা ব্লক কমিটির সভাপতি গৌর বিশ্বাস। মোট ৪০ জনের টিম এই তিনটি ক্যাম্প পরিচালনা করেন। ক্যাম্প প্রাঙ্গণেই ডাঃ কাফিল খানকে রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্র তুলে দেন রিলিফ এন্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ-সভাপতি সন্দীপ দত্ত ও কোষাধ্যক্ষ মলয় পাল।

ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডাঃ কাফিল খান

তেলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদ বাইক ট্যাক্সি চালকদের

অবিলম্বে পেট্রল ডিজেলের উপর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সেস প্রত্যাহার করতে হবে, গণ পরিবহণে ব্যবহৃত পেট্রল ডিজেল সেসবিহীন দামে দিতে হবে— এই দাবিতে ৫ জুলাই মৌলালি মোড়ে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়নের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান।

তালতলা থেকে মিছিল করে মৌলালিতে অবরোধ করেন তাঁরা। নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। কুশপুত্তলিকায় আগুন দেন সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষ। বক্তব্য রাখেন সহ সম্পাদক মলয় পাল। দুই শতাধিক বাইক চালক উপস্থিত ছিলেন।

কালিয়াগঞ্জে বিক্ষোভ

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কালিয়াগঞ্জ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং রেল ব্যাঙ্ক-বিমা খনি সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ও কৃষক মারা কালা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে ১ থেকে ৭ জুলাই প্রতিবাদ দিবস রাজ্য জুড়ে পালিত হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে কালিয়াগঞ্জ এর বিবেকানন্দ মোড়ে প্রতিবাদ সপ্তাহের কর্মসূচি পালিত হয়। নেতৃত্ব দেন কালিয়াগঞ্জ ব্লক এর ইনচার্জ কমরেড গোপাল দেবনাথ, শশী সরকার, সম্ভু সরকার, ধূলাস সরকার।

লোকাল ট্রেন চালুর দাবি নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের

লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে ২৯ জুন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে মেছেদা, পাঁশকুড়া, তমলুক, কোলাঘাট, ভোগপুর, কাঁথি সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্টেশনে স্টেশন-ম্যানেজারের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ডিভিশনাল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে মঞ্চের রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকার কারণে রেল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নিত্যযাত্রী, হকার সহ সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালুর দাবি কৃষ্ণনগরে

অবিলম্বে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালু করা, রেল-ব্যাংক-স্বাস্থ্যকর্মীদের মতো সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের রেলে যাতায়াতের সুযোগ দেওয়া সহ নানা দাবিতে ২৭ জুন কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশনে বিক্ষোভ দেখায় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস। স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বলা হয়, সাধারণ শ্রমিকদেররেলে চড়ার সুযোগ না থাকার ফলে কাজের জন্য তাদের অন্য গণপরিবহণ ব্যবহার করতে হচ্ছে, যাতে অনেক বেশি ভাড়া গুনতে হচ্ছে যা স্বল্প উপার্জনকারীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

সন্দেশখালিতে ত্রাণ সিপিডিআরএসের

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএসের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ১ জুলাই সন্দেশখালির মণিপুর পঞ্চায়েতের জয়গোপালপুর গ্রামে ইয়াসে দুর্দশাগ্রস্ত প্রায় ১০০ মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। মানবাধিকার কর্মী শেখ আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা চৌধুরী সহ চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল খাদ্যসামগ্রী ও মাস্ক তুলে দেন।

তমলুকে মহিলাদের বিক্ষোভ

ভুয়া ভ্যাকসিন কাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দ্রুত সকল নাগরিকের ভ্যাকসিন, পেট্রল ডিজেল ও রান্নার গ্যাস, সরিষার তেল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে লোকালট্রেন চালু, সমস্ত মদের দোকান বন্ধের দাবিতে ৩০ জুন তমলুকের মানিকতলায় শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ মিছিল করল এআইএমএসএস।

উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের তমলুক শাখার সম্পাদিকা প্রতিমা জানা, জেলা সহ সভানেত্রী শীলা দাস, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শ্রাবন্তী মাঝি, অসীমা পাহাড়ি, সরলা মান্না,মৌমিতা প্রামাণিক প্রমুখ।

এআইডিএসও-র আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ কুলতলির গোপালগঞ্জ হাইস্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি-ফি মকুব করার দাবিতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত আন্দোলনের চাপে ভর্তি-ফি-এর অধিকাংশ মকুবের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহার ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়নি। তাই পরীক্ষার ফি ফেরত ও করোনা পরিস্থিতিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কোনও ফি ছাড়াই ভর্তির দাবিতে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি বাজার ট্রাফিক মোড়ে ৩০ জুন বিক্ষোভ দেখায় এ আই ডি এস ও হলদিবাড়ি শাখা। ব্লকের এসআইকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। একই দাবিতে ওই দিন সিতাইয়ে বিডিও এবং এসআইকে ডেপুটেশন দেয় এআইডিএসও।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর জুলুমবাজি

ছয়ের পাতার পর

করেছিলেন। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সর্বাধিক পরিষেবা দেওয়া। এই নীতি বহু মানুষকে আকর্ষিত করেছিল। দেশে দেশে জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করে বহু পুঁজিবাদী দেশ বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ বিনামূল্যে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই ধারায় সরকার বিদ্যুৎকে পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করে। আজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিপর্যয় এবং গণআন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিদ্যুৎকে পরিষেবা থেকে পণ্যে রূপান্তরিত করছে। যার ফলে জনগণকে অত্যধিক মাশুল দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

আজ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সামনে একটাই পথ— তা হল জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও তার (সংশোধনী) বিল ২০২১ প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। অ্যাবেকার এই মুহূর্তের দাবি, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে আগামী এক বছর বিনামূল্যে বিদ্যুত দিতে হবে, গৃহস্থে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে এবং এল পি এস সি / ডি পি এস সি ২৪ শতাংশে নয়, ব্যাঙ্ক রেটে করতে হবে। এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অ্যাবেকা ৭ জুলাই সারা রাজ্যে দাবি দিবস পালনের ডাক দিয়েছে। সরকার দাবি না মানলে আন্দোলন তীব্রতর করার জন্য বিদ্যুৎ গ্রাহক সহ সর্বসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন অ্যাবেকা নেতৃত্ব।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com